ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৫, জানুয়ারি, ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
Vol. 11th Issue 25th, Jan., 2024

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 25th, 29th Jan., 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
১১ তম বর্ষ ও ২৫ তম সংখ্যা
২৯ জানুয়ারি, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল, ড. প্রবীর প্রামাণিক,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। ২০০০ - ২৫০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।
২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।
৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।
৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

নাট্যশাস্ত্রে পোশাক ও ঐতিহ্য
নীলকান্ত বিশ্বাস ১৫
উত্তর পূর্বের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতীক:
অঞ্জলি লাহিড়ীর ‘‘বিলোরিস’’
চৈতালী ভৌমিক ২৬
বাংলার অনন্য সৃষ্টি দশাবতার তাস
সুজাতা দে ৩৪
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষার উদ্বেগ কাটিয়ে উঠা
সুনীল কুমার বাস্কে ৪১
বনফুলের গল্পে (নির্বাচিত) মানুষ আর তার যাপনের মিছিল
সুদীপ্ত চৌধুরী ৪৯
সন্তোষকুমার ঘোষের ‘শেষ নমস্কার :
‘শ্রীচরণেষু মাকে’ - এক পুত্রের মাতৃতর্পণ
সাথী ত্রিপাঠী ৬০
বাংলা মঞ্চ ও অভিনয়ের বিবর্তনরেখা :
শম্ভু মিত্রের বুদ্ধিদীপ্ত আলোকপাত
লিপিকা সরকার ৬৮
লোকতৈজস শাল পাতার বাসন
রত্নাঙ্কুর মিত্র ৭৮
বাংলায় কালীপূজার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
জিতেশ চন্দ্র রায় ৮৫
গণিকা ও জীবনযাত্রা: ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাস
লোপামুদ্রা গাঙ্গুলী
শিউলি মণ্ডল
শুভদীপ মণ্ডল ৯৭
রবীন্দ্রকবিতায় বৈচিত্র্য ও অনন্যতা
শিপ্রা দত্ত (ঘোষ) ১০৮

কারবালার বিষাদময় আখ্যান গীতি : জারিগান
সুকান্ত ঘোষ ১১৫
নজরুলের রোম্যান্টিক মানস : অন্তরঙ্গ অবলোকন
মোরশেদুল আলম ১২৫
'মহানদী' ও 'মহাকান্তার' : অনিতা অগ্নিহোত্রীর উপন্যাসে মিথ
শতাক্ষী কুণ্ডু ১৩৬
নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবনে
সংগীতের ভূমিকা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা
প্রীতম কাঠাম ১৪৬
বিবেকানন্দের শিক্ষামূলক চিন্তাধারা এবং আজকের
শিক্ষা ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব
সার্থক মন্ডল ১৫৫
চার্বাক দর্শনের আলোকে পুরুষার্থ : একটি আলোচনা
নবনীতা রায় ১৬৮
ভাষাদর্শনে রাসেলের বর্ণনাতত্ত্ব : একটি বিশ্লেষনাত্মক আলোচনা
ফারহিন হোসেন ১৭৬
নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর :
প্রসঙ্গ সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা প্রসার
শাশ্বতী সেনগুপ্ত ১৮৬
মৃত্যুচেতনার আলেখ্যে কবি জীবনানন্দ দাশ ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়
সুব্রত মাহাত ১৯৫
রবীন্দ্র গানে ও উপন্যাসে বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া
কিশোরী মণ্ডল ২০৫
'নবান্ন' নাটকে মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষের প্রতিচ্ছবি
রাকেশ চন্দ্র সরকার ২১৫
গোখলে ও তিলকের জাতীয়তাবাদ : তুলনামূলক মূল্যায়ন
রূপা মন্ডল ২২২
রাশিয়ার চিঠি : সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের রূপরেখা
অনুপ দাস ২২৮

নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) সন্ন্যাস-পরবর্তী জীবনে সংগীতের ভূমিকা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

প্রীতম কাঠাম
সহকারী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ
মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যাবার পূর্ব ও পরবর্তী কালে নরেন্দ্রনাথের অবিচল সংগীতপ্রেম, সংগীত গ্রন্থ প্রণয়ন, শিষ্য তথা গুরু-ভাইদের সংগীত-শিক্ষা প্রদান, জীবনের নানা মুহূর্তে সংগীতের সাথে পথ চলা এই আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। সন্ন্যাস পূর্ববর্তীকাল সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা সম্পন্ন করেছি। নরেন্দ্রনাথ জীবনের এই সংঘাত-সংকুল পর্বের সমস্ত আলোড়ন ও উদ্বেলতার মধ্যেও সংগীতকে তিনি কখনো ত্যাগ করেননি; বরঞ্চ সংগীত অনেক সময় তাঁর জীবনের অন্তরঙ্গ বাণী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসী; আবার অপরদিকে সংগীত অনুরাগী, রচনা করেছেন অন্তর্জগতের ভাবপ্রকাশক একাধিক সংগীত। নরেন্দ্রনাথের জীবনকালকে দু-ভাগে ভাগ করলে দেখে যাবে যে ; একটি ভাগ গৃহস্থজীবন যা আগেই আলোচনা করেছি। আরেকটি সন্ন্যাসজীবন।এই দ্বিতীয়ভাগে দেখা যায় বৈরাগ্য ও নিরলস কর্মপ্রবাহতা। সন্ন্যাসজীবনে সংগীতের গুরুত্ব, এই আলোচনার প্রধান উপজীব্য।
সূচক শব্দ: সংগীত, নরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সন্ন্যাস, শ্রীরামকৃষ্ণ, গিরিশচন্দ্র, গান, যাত্রা, ভ্রমন।

নরেন্দ্রনাথ মাত্র ২৪ বছর বয়সেই শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ বসাকের সাথে প্রকাশ করলেন একটি বিভিন্ন প্রকারের সংগীত সংকলিত পুস্তক যার নাম রাখা হয়েছিল ‘সঙ্গীতকল্পতরু’(১৮৮৬ খ্রীঃ, ভাদ্র, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। যার বেশিরভাগ সংগ্রহের কাজ নরেন্দ্রনাথ করেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ বসাক মহাশয়। এই গ্রন্থে মোট ৬৪৭ টি গান, সংগীততত্ত্ব, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কত তথ্য, পাখোয়াজের বোল ইত্যাদি সংকলিত। এই গ্রন্থের ‘সংগীত সংগ্রহ’ অংশে মোট ৮টি পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যথাক্রমে- জাতীয় সংগীত (৩৮টি), ধর্মবিষয়ক সংগীত(১৭১টি), পৌরাণিক সংগীত (১০৩টি), ঐতিহাসিক সংগীত (১৬টি), সামাজিক সংগীত (৩৫টি), প্রণয় সংগীত (১৩৮টি), বিবিধ সংগীত (১২৫টি) এবং নানা বিষয়ক সংগীত (২১টি)। এই গ্রন্থে আনুমানিক ১৭৬ জন গীতিকারের গানও সংকলিত হয়েছে। স্বামীজী রচিত সংগীতগুলি সম্পর্কে শেষে আলেচনা করা হল।

পিতৃবিয়োগ তথা জ্ঞাতিদ্বন্দ্ব নরেন্দ্রনাথকে বিচলিত করে তুলেছিল ভীষণভাবে। সংসারের ভার, জীবিকার জন্য অর্থ উপার্জন, কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে তিনি অস্থির হয়ে

ওঠেন। উপার্জনের সর্বপ্রকার উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করলেন যেমন, কখনো উকিলের বাড়ির অফিসে আংশিক কাজকর্ম, কখনো বা পুস্তকরচনা, কখনো বা গ্রন্থানুবাদ, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত বউবাজারের মেট্রোপলিটন স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করা ইত্যাদি। এর সাথে সাথে আইনি কলেজে পড়াশোনাও চলছিল নরেন্দ্রনাথের। একদিকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের খোঁজ, আর একদিকে জ্ঞ্যাতিদ্বন্দ্ব, আইনি মামলা মোকদ্দমার ফল স্বরূপ কোন কাজকেই নরেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়িত করতে পারলেন না। এই সময় (১৮৮৪-৮৫) নরেন্দ্রনাথের এইসব নানা মানসিক অশান্তির কারণে সংসার বিষয়ে অনাসক্তি দেখাদেয় । শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে বৈরাগ্য যেন নরেন্দ্রনাথকে প্রবল আকর্ষণ করেছিল ঠিক এই সময়। জীবনের এই দুরূহ সময়ে সঙ্গীত নরেন্দ্রনাথের মানসিকতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেছেন- "১৮৮৪ সালে 'চৈতন্যলীলা' অভিনয় খুব চলিতেছিল। শহরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।... অভিনয় সম্বন্ধে একটা বড় পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্বে এরূপ আন্দোলন হয় নাই।... শনিবার বৈকালবেলা বাবুরাম মহারাজ ও অপর দুই তিনজন ৩নং গৌরীমোহন মুখার্জী বাটিতে আসিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।...নরেন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে অভিনয় দর্শন করিতে গেলেন। সেই সময় নরেন্দ্রনাথ চৈতন্যলীলার গান গাহিতে: রাধা বই আর নাইকো আমার....,"।[১] এছাড়াও চৈতন্য বিষয়ক কিছু গান তিনি গাইতেন যেমন- 'তুমি দ্বারে দ্বারে নাকি কেঁদেছো'... ইত্যাদি। জীবনের এক এমন অস্থির পরিস্থিতিতে এই কীর্তনাঙ্গীয়ভাব-রঞ্জিত সংগীত নরেন্দ্রনাথের মনের সাথে যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চৈতন্যলীলার পরের বছর গিরিশচন্দ্র ঘোষের "বুদ্ধদেব চরিত" নাটকে ব্যবহৃত গান সম্পর্কে। "এই নাটকের 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই' বৈরাগ্যপূর্ণ গীতিটি গিরিশচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। গানখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় ছিল। এই গীতখানি গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দ স্বামী আত্মহারা হইয়া যাইতেন"।[২] এই প্রসঙ্গেই মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন, "তৎপ্রণীত বিখ্যাত গীত: জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই ?... এই গানটি নরেন্দ্রনাথ হৃদয়ের অন্তর হইতে গাহিতেন। সংগীতকালে যেন এক বৈরাগ্যের হিল্লোল চারিদিকে প্রবাহিত হইতো। শ্রোতৃবর্গের মন যেন রাগ স্পন্দনের সহিতকোথায় উড়িয়া যাইত। নরেন্দ্রনাথ যখন এই গানটি গাহিতেন, তখন যেন প্রত্যক্ষ স্পষ্ট কি একটা ভাব উঠিত; লোক যেন মাতোয়ারা হইয়া উঠিত"।[৩] তিনি অন্যত্র একটু বিস্তারিত ভাবেই বলেছেন যে, "নরেন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধদেব চরিতের গান গাহিতেন সেই কয় মাস তাহার বাহ্যিক জ্ঞান অনেক সময় থাকিত না। নিজে যেন শরীরটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন এক জগতে বসিয়া আছেন"।[৪]

স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল'- এর উদ্বোধন হয় ১৮৮৬ এর জুলাই মাসের প্রথম দিকে। মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন "...নরেন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চেতে

বসিয়া একটি তানপুরা লইয়া স্থির ভাবে ভজন গাহিতে আরম্ভ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ একাগ্রতায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়ায় তাহার শক্তি জাগিয়া উঠিল। চক্ষু নির্মলিত, কণ্ঠ হইতে ভক্তিপূর্ণ স্বর উঠিতেছে এবং দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ধারা বিগলিত হইতেছে।... গিরিশবাবু তখন নরেন্দ্রনাথের ধ্যান ও গভীর চিন্তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া একটু চিন্তিত ও উন্মনা হইলেন, এবং ঐরূপ ভাব আর যাহাতে বর্ধিত না হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে তিনি নরেন্দ্রনাথের হাত হইতে তানপুরা উঠাইয়া লইলেন এবং নরেন্দ্রনাথের হস্ত ধারণ করিয়া মঞ্চ হইতে বাহির হইয়া নিজের গাড়িতে বসাইলেন এবং বাগবাজারে আনিলেন"।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ থাকাকালীন কাশীপুর বাগানবাড়িতে নরেন্দ্রনাথ রাত্রিযাপন করতে আরম্ভ করলেন এবং খুব বিশেষ কারণ বা প্রয়োজনে ছাড়া নিজগৃহে যাতায়াত করতেন না বললেই চলে। অর্থাৎ এখানে ধরে নেওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে অবস্থানের সময় থেকেই নরেন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগের কিছুদিন আগে নরেন্দ্রনাথ সহ আরো কিছু শিষ্যদের সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন মন্ত্র তথা গৈরিক বস্ত্র প্রদানের মাধ্যমে। এরপর প্রায় একবছর পর নরেন্দ্রনাথ এবং তার ১৬ জন গুরুভ্রাতা একই সাথে আটপুরে বিরজাহোম করে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।কিন্তু মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণীতে পাওয়া যায়, "বরানগর মঠ স্থাপনের কয়েক দিবসের মধ্যেই সকলে রাস্তার দিকের বিল্ব বৃক্ষমূলে বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন"।[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ যাবার আগে থেকেই নরেন্দ্রনাথের মনে গড়ে উঠেছিল সংঘের বীজ। তাকে সংরক্ষণ এবং লালন পালন করার বিষয়েও প্রধান যিনি ছিলেন তিনি হলেন নরেন্দ্রনাথ। এই পর্বেও নরেন্দ্রনাথের সংগীত চর্চা কিন্তু বন্ধ না হয়ে বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। নরেন্দ্রনাথ এই পর্বে শুধু গান গেয়েছেন এমনটা নয়, একাধিক গান রচনাও করেছেন। "সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় একটি প্রাচীন ও জীর্ণ বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো বরানগরে প্রামাণিক ঘাট রোডে"।[৭] এই বাড়িতেই ক্রমে ক্রমে নরেন্দ্রনাথ সহ সকল শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শীষ্যবর্গ আশ্রয় নিতে শুরু করে যা পরবর্তীকালে 'রামকৃষ্ণ সংঘ' তথা 'বরানগর মঠ' নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়। শুরুতে বিভিন্ন প্রতিকূলতা থাকলেও পরবর্তীকালে মঠের অন্যান্য কাজকর্ম যথা- সাধন ভজন, বিদ্যা চর্চা, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের সাথে সাথে সঙ্গীত এখানকার সাধন-ভজনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে ছিল প্রতিষ্ঠিত, যার মূলে ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথের কয়েকজন গুরুভ্রাতাও ছিলেন সংগীত প্রিয় এবং কিছুজন তো রীতিমতো সংগীতচর্চা করেছিলেন পূর্বাশ্রমে। ফলে সংগীতের পরিবেশ সৃষ্টিতে কোন বাধা উৎপন্ন হতে দেখা যায়নি। গুরুভ্রাতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কালিবেদান্তি বা কালি তপস্বী যাকে আমরা পরবর্তীকালে স্বামী অভেদানন্দ নামে চিনেছি। তিনি মঠে কখনো কখনো গান গাইতেন; তাছাড়া পাখোয়াজ সহ নানান বাদ্যযন্ত্র বাজাতে

পারতেন।“তিনি প্রখ্যাত পাখোয়াজ বাদক শ্রী গোপালচন্দ্র মল্লিকের শিষ্য ছিলেন। এছাড়াও রাখাল মহারাজ অর্থাৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নামও আমরা পেয়ে থাকি এই বিষয়ে।[৮]পরবর্তীতে তারক মহারাজ অর্থাৎ স্বামী শিবানন্দ গান গাইতেন এবং মঠে তাঁর একদিন বিদ্যাপতির বিখ্যাত পদ্ “হরি গেও মধুপুর” গান গাইবার বিবরণ পাওয়া যায় মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে।[৯] শরৎ মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সারদানন্দ এই মঠে অবস্থানের পূর্বে বাগবাজারের রাখাল হালদার মহাশয়ের ভাইয়ের কাছে প্রায় ছয়মাস সংগীত শিক্ষা করেছিলেন।[১০] এরপর মঠে অবস্থানকালীন নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছিলেন বলে জানা যায়। “শরৎ মহারাজ এই সময়ে নরেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেন, কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপিয়ে গান করার অভ্যাস করায় সর্বদাই ধমকানি খাইতেন”।[১১] মঠের সাধারণত ব্রহ্মসংগীত, শ্যামা সংগীত, ভজন ইত্যাদি গাওয়া হত। মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে “সংগীত চর্চায় মন যে কত উচ্চদিকে লইয়া যায় এবং ইহা ঈশ্বরোপলব্ধির উপায়, সকলেই তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। এক একদিন সংগীত বা ভজন এমন জমিয়া যাইত যে, আহারের জন্য কোন হুঁশ থাকিতো না, সকলেই তন্ময় হইয়া থাকিত। নরেন্দ্রনাথ এক এক দিন তানপুরা লইয়া সংগীত আরম্ভ করিতেন, তাহাতে সকলেই বিভোর হইয়া থাকিতেন”।[১২] শাস্ত্রীয় সংগীত অর্থাৎ ধ্রুপদ সংগীত পরিবেশন সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন যে- “...শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পরে তাঁহার জন্মতিথি উপলক্ষ করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে একটি করিয়া উৎসব হইতে লাগিল।... নরেন্দ্রনাথও এক বছর অনবরত ধ্রুপদ গান গাহিয়াছিলেন”।[১৩] কীর্তন প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ স্বামী প্রেমানন্দ কথিত এই বিবরণটি দিয়েছেন -“...অল্পক্ষণ পরেই হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের মুখভঙ্গি, কণ্ঠস্বর ও অবয়ব সম্পূর্ণ বদলে গেল, সিংহ গর্জনে বলতে লাগল বোল হরিবোল হরি হরি বোল'।...এর পূর্বে সকলে অসংযত চিত্তে বসেছিল, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের সিংহগর্জন শুনে সকলেই ত্রস্ত হয়ে পড়ল। অনতিবিলম্বে সকলের দাঁড়িয়ে উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করতে লাগল। ঠাকুরের ঘর থেকে খোল করতাল এনে বাজাতে লাগলো। কিন্তু অনবরত খোল বাজানো এত দুরূহ হয়েছিল যে, পর্যায়ক্রমে তিন জনকে খোলটা ঘাড়ে করতে হয়েছিল, তবুও তাদের আঙ্গুলগুলো ফুলে গিয়েছিল।...অবিরাম হুংকারধ্বনী, উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন। নরেন্দ্রনাথের এবং আর সকলের চোখ থেকে অশ্রুধারা পড়ে মুখ আর বুক ভেসে যাচ্ছে; কিন্তু নৃত্য-কীর্তন বন্ধ নাই।...নিচেকার উঠান সব লোকে ভরে গেছে, রাস্তায় লোক জমে গেছে।... আমি বাইরে এসে দেখি কিনা উঠানে কত লোক; রাস্তায় লোকারণ্য।...কীর্তন আরো খানিক্ষণ চলে বন্ধ হল। লোকেরা সব বলতে লাগল, 'দাদাঠাকুর, এমন কীর্তন কখনো শুনিনি এমন মধুর হরিনাম কখনো শুনিনি”।[১৪]

নরেন্দ্রনাথের অন্তরে ভ্রমনের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বরানগর মঠের অবস্থানকালে প্রথম দুবছর তিনি বিশেষ কোথাও যাননি, (পাছে মঠের সাংগঠনিক ক্ষতি হয়) শুধুমাত্র আটপুরে, বৈদ্যনাথ, শিমুলতলা বাদে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে একবার পশ্চিমে

যাত্রা করেছিলেন বলে জানা যায়।[১৫]সে সময় তারি প্রথম শিষ্য হয়েছিলেন শরৎচন্দ্র গুপ্ত নামে এক প্রবাসী বাঙালি। বৃন্দাবনের কাছে হাত্রাস স্টেশনে স্বামীজি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় ভারাক্রান্ত হয়ে আপন মনে একটি ব্রহ্মসংগীত গান গাইছিলেন "...সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে কেন ভ্রম অকারণে..." স্টেশন রেলকর্মচারী শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর সংগীতে আকৃষ্ট হন এবং আলাপচারিতা শুরু করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্রকে সন্ন্যাসগ্রহণের প্রেরণা দেয় স্বামীজীর এই সংগীত।"তাহার মুখে গানটি শুনিয়া উক্ত কর্মচারীর যেন মুহূর্তে সব ভাব বদলে গেল -তাহার আর চাকরি করা বা বাড়ি-ঘর-দোরের কথা যেন চিরকালের জন্য একেবারে মন থেকে দূর হয়ে গেল। বাবা, মা, ভাই, বোন, সকলই তার ছিল; কিন্তু সে তখন যেন অন্য প্রকার হইয়া উঠিল। সংসারে কোন বিষয়ই যেন তার আর উপাদেয় বোধ হইল না।.. তারপর গুপ্ত স্থির করলে কাজকর্ম ছেড়ে সন্ন্যাস নিতে হবে"।[১৬] শরৎচন্দ্র সেখান থেকেই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গ নেন এবং পরে বরানগর মঠে যোগদান করে স্বামী সদানন্দ রূপে পরিচয় লাভ করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক জীবন শুরু হয়। প্রায় তিন বছর তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের যে ভীষণ দুর্গতি তা তিনি উপলব্ধি করেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, নরেন্দ্রনাথ এই পরিব্রাজনকালে বিবেকানন্দ নামটি না ব্যবহার করে, 'বিবিকিৎসানন্দ', 'সচ্চিদানন্দ' ইত্যাদি নাম ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। এই নাম রহস্যহয়ত সন্ন্যাসীর আত্মগোপন তথা তীব্র বৈরাগ্যের ফল। এই সময় তিনি তাঁর পরিচিত-জগত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে রেখেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতারা পর্যন্ত বিষয়টি জানতে পারেননি। অবগত ছিলেন মাত্র চারজন -শ্রীমা সারদাদেবী, সান্যাল মহাশয়, স্বামীসারদানন্দ এবং মহেন্দ্রনাথদত্ত।[১৭] পরিব্রাজক জীবনেও স্বামীজী দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশন করে বহু লোককে মুগ্ধ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে কিছু বিবরণ এখানে উল্লেখ করবার চেষ্টা করছি। মহেন্দ্রনাথ দত্তের বিবরণী থেকে পাওয়া যায়, "একদিন অপরাহ্নে নরেন্দ্রনাথ এবং অপর সকলে একত্রিত হইয়া ভজন ও সংগীত করিতে ছিলেন। ভাব জমিয়ে গেল। সংগীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল। গোবিন্দ ডাক্তারের মনে বিশেষ ভক্তি আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুর সংগীতে মনের আবেগ অধিকতর বৃদ্ধি হওয়ায় ভাব সম্বরন করিতে না পারিয়া দুই নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির গানে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন"।[১৮] স্বামীজি এই পরিব্রাজক জীবনে রাজস্থান, জয়পুরের নিকট খেতরীতে অবস্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেখানকার রাজা অজিত সিংও স্বামীজীর শীষ্য হয়েছিলেন এ কথা সকলেই জানি। খেতরীরাজ বিশেষ সংগীত-প্রেমী ছিলেন। এই স্থানে স্বামীজী রাগ-সংগীতচর্চা তথা পাখোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিলেন বলে জানা যায়। "খেতরী রাজসভাতেও তিনি দরবারি কানাড়া, ইমনকল্যাণ ও বাগেশ্রী আলাপ করিয়া ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন"।[১৯] এরপর স্বামীজী গুজরাট হয়ে

জুনাগড়ে কিছুকাল অবস্থান করেছেন। সেখানে রাজদেওয়ান হরিদাস বিহারী দাসের বাড়িতে অবস্থানকালীন রাঁধুনীদের আনন্দ দিতে তিনি কিছু গান শুনিয়ে চাহিদা মত খাবার তৈরী করিয়ে নেবার কথা আমরা জানতে পারি, যা কিনা স্বামীজী লন্ডনে অবস্থানকালে স্বামীজীর বক্তব্যে মহেন্দ্রনাথ দত্ত উদ্ধৃত করেছেন।[২০]

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কালে তিনি মাদ্রাজে অবস্থানকালেও সংগীত পরিবেশন করেছিলেন যার কথা আমরা জানতে পারি মন্মথনাথের লেখা চিঠি থেকে।[২১] চিঠিটি তিনি শ্যামবাজারে ভ্রাতা মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন স্বামীজি সম্পর্কে খবরাখবর নেবার জন্য। এই চিঠিতেও স্পষ্ট জানা যায় যে, ভট্টাচার্য মহাশয় নিশ্চিত স্বামীজীর গান শুনেছিলেন।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে স্বামীজী বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও মাদ্রাজ থেকে বোম্বাই হয়ে জাহাজে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছেও নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে চিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনে তিনি সেই জগৎবিখ্যাত বক্তৃতামালা প্রদান করেন। এই পর্বে সংগীত সম্পর্কে বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায়না। তবে লন্ডনে অবস্থানকালীন কিছু কিছু জায়গায় স্বামীজীর গাওয়াসংগীত বিষয়ে জানা যায়। রমাঁ রোলাঁর রচনা থেকেপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ম্যাডাম কালভে় নিশ্চিত স্বামীজীর সংগীত শুনেছিলেন। এই পর্বে সঙ্গীতকে তেমনভাবে আমরা পাই না। একেই বিদেশ বাংলা গান বা হিন্দি ভাষায় গান শোনার বা বোঝার মতো লোক পাওয়া দুষ্কর। স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যও আলাদা, সংগীত এখানে খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়। হ্যাঁ, তবে দেখা গেছে স্বামীজীকে গুনগুন করতে, নিজের মনে নিজে গান গাইছেন।[২২]

পাশ্চাত্যে আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে স্বামীজী প্রায় চার বছর পর(১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ) দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই ১৮৯৭ এর ৩১শে আগস্ট অমৃতসর থেকে রাওলপিন্ডি আসেন এবং সেখানকার কিছু বাঙালি অধিবাসীদের নিমন্ত্রনও রক্ষা করেন স্বামীজি। সেখানে ধর্ম-উপদেশ প্রদান তথা সংগীতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। "তাহাদের গৃহে যাইয়া স্বামীজি অনেক ধর্ম-বিষয়ক গান গাইলেন এবং তাহাদের অনেক উপদেশ দিলেন"।[২৩] এছাড়াও ওই বছর ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখেও শ্রীনগরের একটি স্থানে তিনি সংগীত পরিবেশন করেছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু এর কোনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। সেইসব স্থান পরিভ্রমণ করে স্বামীজী মঠে ফিরে আসেন। তিনি কলকাতায় ফিরে এসেই স্থায়ী মঠ নির্মাণকার্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো নিবেদিতাকে দীক্ষাদান প্রসঙ্গে "...অতঃপর এক ঘন্টা ধরিয়া তিনি ভারতীয় সংগীত আলাপন করিলেন"।[২৪]এখানে দেখা যাচ্ছে তিনি এক ঘন্টা ধরে ভারতীয় সংগীত অর্থাৎ রাগ সংগীতের আলাপ গাইছেন। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তিনি ধ্রুপদের আলাপ (যেমন ডাগর-বাণী), যা কিনা অনেকক্ষণ ধরে গাওয়া হয়ে থাকে তাই গাইছেন। পরের বছরই ১৮৯৮ এরমে-জুন মাসের দিকে

তিনি শিষ্যও পার্ষদবর্গ নিয়ে আলমোড়া, ভীমতাল প্রভৃতি অঞ্চলে যাত্রা করেন। এ জায়গাতেও সংগীতের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।-"…. স্বামীজী এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যের মধ্যে বসে 'অসতো মা সদ্গময়ো'...ইত্যাদি আবৃত্তি ও অনুবাদ করলেন। শেষে সুরদাসের 'প্রভু মেরো অবগুণ চিতনা ধরো' গানটি গান। এই গান তিনি ক্ষেতরীর রাজার সভায় নর্তকীর নিকট শুনেছিলেন"।[২৫]ভগিনী নিবেদিতা লিখিত 'স্বামীজীর স্মৃতিকথা' গ্রন্থে স্বামীজীর কিছু সঙ্গীত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়- "now it was the coronation song of Akbar, which is still song about the streets of Delhi, that he would give us, in the very tone and rhythm of Thaanasena".[২৬] এই বইয়েই নিবেদিতা জানাচ্ছেন যে – "এই বছর আচার্যদেব ক্রমান্বয়ে ২৪ ঘন্টাই কাজ করতেন।…. তারপর সকলে বসতেন ধ্যান করতে এবং তারপরে প্রায় অজ্ঞাতসারেই আরম্ভ হয়ে যেত গান আর নানা প্রসঙ্গ, যা চলত প্রায় দুপুর পর্যন্ত।স্তব আর স্তোত্র থেকে এসে পড়ত ইতিহাসের প্রসঙ্গ"।[২৭] 'স্বামী -শীষ্য সংবাদ' গ্রন্থে শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী **১৮৯৮** এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারীর কথা জানাচ্ছেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বসতবাটিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বামীজীর পৌরহিত্য সম্পর্কে- "ঘোষ ও তাহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা- স্বামীজী দ্বারা বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন।...মঠ হইতে তিনখানি ডিঙি ভাড়া করিয়া স্বামীজি-সমভিব্যাহারে মঠের যাবতীয় সন্ন্যাসী ও বালক ব্রহ্মচারীগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন।…. ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী 'দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছে আলো করে, কে রে ওরে দিগম্বর এসেছে কুটীরঘরে' গানটি করিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর দুই তিনখানা খোল সঙ্গে সঙ্গে বাজিতে লাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমস্বরে ওই গান গাহিতে গাহিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদ্দাম নৃত্য ও মৃদঙ্গধ্বনিতে পথ-ঘাট মুখরিত হইয়া উঠিল; যাইতে যাইতে দলটি শ্রীযুক্ত রামলাল ডাক্তারবাবুর বাড়ির কাছে স্বল্পক্ষণ দাঁড়াইল"।[২৮]

জীবনের প্রায় শেষকাল পর্যন্ত স্বামীজীর সঙ্গীত পরিবেশন সম্পর্কে তাঁর নানা জীবনী গ্রন্থে পাওয়া যায়। শরীর যাওয়ার কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের কথা আমরা জানতে পারি। স্বেচ্ছায়, কখনো কারো অনুরোধে অথবা কখনো কোন উৎসব উপলক্ষে তাঁকে গান গাইতে দেখা যেত।"দেহত্যাগের পূর্বে কয়েক মাস" এর বিবরণ দেওয়ার সময় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীকার জানিয়েছেন যেতিনি শেষ রাতে সজ্জা ত্যাগ করে ঠাকুরঘরে ধ্যানান্তে. শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রণামান্তে নিচে গিয়ে পায়চারি করার সময়-"কখনো শ্যামা সংগীত বা শিব সংগীত বা অন্য কোন ধর্ম-বিষয়ক গান গাহিতেন"।[২৯]

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনে যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে যে সংগীত রচনাও করেছিলেন, যা ছিল বেশিরভাগই উচ্চ শ্রেণীর ধ্রুপদাঙ্গ-বিশিষ্ট সংগীত। স্বামীজীর রচিত বাংলার গানের সংখ্যা মাত্র ছয়টি। গানের পরিমাণের চেয়েও বড় কথা

হলো তার উৎকর্ষতা। অর্থাৎ যে গানগুলি তিনি রচনা করেছেন তার গুণাবলী, তার ভাব, গঠন এবং ভাষা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এই গানগুলি স্বামী বিবেকানন্দের রাগ-সঙ্গীতের যে গভীর অনুশীলন তা জানার ও বোঝার জন্য যথেষ্ট। সব গানের রচনাকাল সঠিকভাবে না জানা গেলেও মোটামুটি তিনটি গানের রচনাকাল পাওয়া যায়। সম্ভবত জীবনের প্রথম ভাগে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার ফলস্বরূপ তাঁর লিখিত সংগীতে অদ্বৈতবেদান্তের বাণী পরিস্ফুটিত হয়েছে।

স্বামীজী ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে বরানগর মঠে প্রথম গান রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। "বরানগরের মঠ সবে চার-পাঁচ মাস স্থাপিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিত্যধামে বেশি দিন যান নাই। শ্রীযুক্ত তারক। আনন্দে শিবের গান ধরিলেন।– "তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।.... এই গান নরেন্দ্র সবে বাঁধিয়াছেন"।[৩০] এরপর যে গানটির উল্লেখ করা হবে সেটিও সম্ভবত বরানগর মঠে প্রথম দিকেই স্বামীজী রচনা করেছিলেন- "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি...এই গানটি স্বামীজী এই সময় রচনা করেন।.... অতুলবাবু বলিলেন, "এই গানটা যে বাঁধতে পারে, সে একটা বড় লোক -এই একটা গানের জন্য সে জগতে বিখ্যাত হ'য়ে থাকবে"।... অতুলবাবুর গানটা এত ভালো লাগিয়াছিল যে, তিনি সকলকেই কাহার রচিত গান জিজ্ঞাসা করিতে লাগলেন। অবশেষে শরৎ মহারাজ ইহা নরেন্দ্রনাথের রচিত বলিয়া দিলেন।...[৩১]এই গানটি ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭ এর মধ্যে রচিত।[৩২]

এখানে স্বামীজি রচিত সংগীতগুলি উল্লেখ করা হল-

১. তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা।(কর্নাটি, একতালা)।
২. নাহি সূর্য নাহি জ্যেতি: শশাঙ্ক সুন্দর,...(বাগেশ্রী, আড়া)।
৩. একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত-আগামী-কাল-হীন,...(খাম্বাজ, চৌতাল)।
৪. মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া যানেকো দে।... (মুলতান, ঢিমাত্রিতালি)।
৫. হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।...(কর্ণাটি, সুরফাঁকতাল)।
৬. খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।...(মিশ্র, চৌতালি)।

তথ্যসূত্র:

১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৮১-৮৩।
২. অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৩১০।
৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫।
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৯০-৯১।
৫. তদেব, পৃষ্ঠা ১২৩-২৪।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা২৮।

৭. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী’, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা: ২০-২১
৮. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘অজাতশত্রু শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান’, পৃষ্ঠা ৪৬।
৯. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান’ পৃষ্ঠা: ৯,৪৮,৫০।
১০. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীর জীবনের ঘটনাবলী’, পৃষ্ঠা ২৯।
১১. তদেব, পৃষ্ঠা২৮
১২. তদেব, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৯
১৩. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী’, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৭।
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা ৪১-৪৩।
১৫. দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, ‘সংগীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সংগীত-কল্পতরু’, অক্টোবর ১৯৬৩, পৃষ্ঠা ৯৮।
১৬. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, “শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী”, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭।
১৭. তদেব, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০০।
১৮. তদেব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬।
১৯. প্রমথনাথ বসু, “স্বামী বিবেকানন্দ”, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ৭৬।
২০. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, “শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী”, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৩।
২১. তদেব, পৃষ্ঠা ২০৩।
২২. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, “লন্ডনের স্বামী বিবেকানন্দ”, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০০।
২৩. উদ্বোধন কার্যালয়, "ভারতে বিবেকানন্দ", পৃষ্ঠা২৯১।
২৪. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রানা, "ভগিণী নিবেদিতা", পৃষ্ঠা৭৬
২৫. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রানা, "ভগিণী নিবেদিতা", পৃষ্ঠা১০১
২৬. Sister Nivedita, 'The Master As I Saw Him',Advaita Ashram,9th edition,1 Feb,1910, page 67.
২৭. তদেব, P-88
২৮. শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, ‘স্বামী শিষ্য সংবাদ’, ষষ্ঠ সংস্করণ, জুন ১৯৬০, পৃ.২১-২২।
২৯. প্রমথনাথ বসু স্বামী বিবেকানন্দ চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১০৭৮
৩০. শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, চতুর্থ ভাগ পৃষ্ঠা ৩৭৮।
৩১. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ‘শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী’, প্রথম খন্ড পৃ- ৮৬-৮৭।
৩২. স্বামী সুপর্ণানন্দ, প্রকাশক, সঙ্গীতকল্পতরু, ১২ জানুয়ারী ২০০০, পৃ- ৩৩১